KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩২৪ ভাদ্র ১৩২৪ কার্ত্তিক ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বাংলার ভবিষ্যৎ।

(মির্জ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, তখন তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের "পত্রসূচনা" বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাব ও সওয়াল-জবাব। বাংলা লেখার জন্য, বাঙ্গালীর পক্ষে স্বদেশীশিক্ষিত সমাজের নিকট কোন-রূপ কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে।

—"যতদিন না শিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই"—

বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহির্ভূত, কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনী ধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরাজির রেওয়াজ এবং ইংরাজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়—অর্থাৎ ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজি পড়তেন, ইংরাজি লিখতেন, ইংরাজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না পড়তেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্ত্তাও

কইতেন ঐ রাজভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না যে,—

"ইংরাজি-লেখক, ইংরাজি-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই।"

(২)

এ খুব বেশী দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্পকাল, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্টত অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের সাধারণ লেখকদেরও কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই কলিকাতা সহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনও সঠিক রেজিষ্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে—তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনও

অভাব নেই। তারপর বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে, নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে' শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়ে সাহিত্য-গগনের শোভা বৃদ্ধি করছে। বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে "প্রতিভা", মৈমনসিং "সৌরভ", বহরমপুর "উপাসনা", এবং কুচবেহার "পরিচারিকা"। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলা-দেশের কোন অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের অনুবাদ।

(৩

এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এদেশে ইংরাজির চর্চ্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরাজি-ভাষাকে এখন বাঙ্গালীর দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগে, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী হাতে গোণা যেত, আর আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে, সরকার বাহাদুরের আদমসুমারির খাতার অনেক পাতা ওল্টাতে হয়। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে "ইংরাজি-বাচক", তাই ছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে,

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে এক নব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না,—এমন কি ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমন কি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত করতে পিছ-পাও হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এ সব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এই সব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, "বাংলা বনাম ইংরাজি" এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপুরি জয়লাভ হয়েছে—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম্ ডিক্রী। ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাজদরবার রাজনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সবই অদ্যাবধি ইংরাজির পুরো দখলে রয়েছে; শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এ সকল ক্ষেত্রে ইংরাজির দখল বজায় রাখাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য মনে করেন। বাংলা ইংরাজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।

এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যের যে বড়দিন এসেছে, সে দিনে বাংলা ভাষা শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও, শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্ব্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে যথেষ্ট

অবজ্ঞা করতেন তার প্রমাণ, তাঁরা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—এ শাস্ত্র-বচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে, অনেকে বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এঁদের পক্ষে একটা সখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়—ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরি মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জনী, তা কাব্য নয়—এবং যা অবসরচিন্তা, তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চ্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতীর সেবা করা যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই,—তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি? আমার মতে বেশীর ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে, পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জ্ঞানকর্ম্মের বিভাগটা উপেক্ষা করলে, কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের ঘর বাঁধে, সে খেলার ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিণ্ডার-গার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যাঁরা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনও বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহুচেষ্টা করতে হবে। বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মের নয়। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে

বাংলা-ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক কর্‌তে হবে, বিচার কর্‌তে হবে, এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ বিসম্বাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গ-সরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে।

(৪)

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনই কারণ নেই। লোকভাষা যে, কোন দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে, ইউরোপের কোন নব ভাষাই একদিনে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী-ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম কর্‌তে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই ঃ—প্রথমত কোনও মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোনও বিদেশী ভাষার, এবং তৃতীয়ত কোনও কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও

পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোক-সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি—সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে কোনরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য বেশী দিন মুক্তিলাভ করে নি—তার প্রমাণ, Bacon তাঁর Novum Organum, Spinoza তাঁর Ethics, এমন কি Newtonও তাঁর Principia ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনও কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় Thesis লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, বর্ত্তমান যুগের দিগ্বিজয়ী দার্শনিক Bergson, তাঁর যুগপ্রবর্ত্তক Time and Freewill নামক গ্রন্থ, আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপার যথার্থই বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিক সমাজে লিপি-চাতুর্য্যে বার্গ্‌সঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই ;—তাঁর হাতের কলম যথার্থই সোণার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃত-ভাষার প্রভাবও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপণেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জর্ম্মান দেশে আজও এমন সব পণ্ডিত আছেন, যাঁদের পাণ্ডিত্য ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়,—কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই সে জাতির কোনও কোনও পণ্ডিত স্বভাষায় লিখ্‌লে, সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজের লেখা নিজেই পড়্‌তে পারেন না,—অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাঁদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাঁদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন

ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করে' নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে, সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল ;—এক কথায়, ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভ দিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।

(৫)

মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশী ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না ; অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশী ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনও দেশের উপর বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, সেই দেশীয় ভাষার উপর বিদেশীয় ভাষার প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ কর্‌তে পারে না। গ্রীস, রোমের অধীন হয়েও পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এদেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল—কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। এ কালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে দিগ্বিজয়ী ভাষা হয়ে উঠেছিল—ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই একযুগে না একযুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউসানে, ইতালির reversion যথার্থই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যাঁরা জীবজগতের ইভলিউসান-তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা এক-রোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউসানের সঙ্গে সঙ্গে reversion, উন্নতির পিঠ পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদূর এগিয়ে তারপর পিছুহটা বোধহয় মানব সভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে, পেট্রার্কা, বোক্কাচ্চিয়ো, মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্ত্তিসকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদি কবি Alfieri তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান জন্মাল যে, সে-সকল নাটক কাব্য নয়—শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা মনে পড়ে। এর পরেই ইতালীয় ভাষা আবার তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে ; তার কারণ, ইতালি আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের এ পারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এদিকের দেশ। আমাদের বিশ্বাস একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গান বাজাতে, আর রঙ-বেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি কর্‌তে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে কাব্যের অর্গানও

যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ D'Annunzio এবং Benedetto Croce-র দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তি।

যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্ব্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্ম্মাণীর সাহিত্যও আবার পাল্‌টে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্ম্মাণীর শিক্ষিত মনকে প্রায় একশ' বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্ম্মাণীতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনরূপ মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্ম্মাণদের কাছে একটি নব Classic হয়ে ওঠে। নব জর্ম্মাণীর আদিকর্ত্তা Frederick the Great নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বল্‌তে ও লিখ্‌তে শিখিয়েছিলেন,—অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্ম্মাণ জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহাল-তবিয়তে এবং খোসমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক Leibnitz এই যুগে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন—সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শন

রচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ, তাঁর পরবর্ত্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কাণ্টের গ্রন্থসকল। সে-সকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের Classic হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়,—কাণ্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্ম্মাণ ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা কর্‌বার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল, মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জর্ম্মাণ ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কাণ্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চল্‌তে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জর্ম্মাণ সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিস্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—এই একশত বৎসর হচ্ছে জর্ম্মাণ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্যরথীদের নামের ফর্দ্দ দিতে হ'লে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ্দ দেবারও কোন দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্ম্মাণ মহারথীদের নাম শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্ম্মাণ প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্ম্মাণ ভাষা এবং সেই সঙ্গে জর্ম্মাণ আত্মা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।

(৬)

অপরপক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুষীয় জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এ যাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি

রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড় ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহঙ্কারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্ম্মাণদের বর্ব্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্ব্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে—সেই জাতি যার ভাষা বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিনকালেও অজ্ঞাত-কুলশীল জর্ম্মাণ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।

এমন কি, যে জর্ম্মাণ দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে—সে দর্শনও ফরাসি মনকে বেশীদিন আত্মবশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক Taine গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্ম্মাণী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একশ'বৎসর যা চিন্তা করেছে—তৎপরবর্ত্তী একশ বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনর্চিন্তা করতে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরাজি দর্শন আমরা চর্চ্চা করি—তা যে গত যুগের জর্ম্মাণ দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নব-কান্‌টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর এসিয়াবাসী হয়েও, জর্ম্মাণ দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বলতে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্ম্মাণীর তৈরি বৈজ্ঞানিক খাদ্য উদরস্থ করছি আর তার জাবর কাটছি। মনো-জগতে যে, ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়—এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও, একরকম

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক বর্ণ জর্ম্মাণ না জেনেও Nietsche-র বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তাঁর কথার দুকুল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot-র নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি Guyot ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্ম্মাণ Nietsche তাণ্ডব-নৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপত দর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে, উপহারসংজ্ঞক ছয়প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে' হাস্য করা, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা, এবং হুড্ডুকার করা—অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চীৎকার করা। Nietsche-র লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপত দর্শন ভারতবর্ষে তার ভব-লীলা সম্বরণ করে জর্ম্মাণীতে আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছে। গেটে এবং কাণ্ট সাহিত্যের জগদ্গুরু হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্ব-মানবের মনের উপর আধুনিক জর্ম্মাণ মনের প্রভাব যেমন অকারণ তেমনি মারাত্মক, কেননা জর্ম্মাণ দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়। জর্ম্মাণ আত্মার অশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ে জর্ম্মাণ আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়তে সুরু করে—ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে সুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে Taine-এর একটি ধনুর্দ্ধর শিষ্য Maurice Barrés, ল্যাটিনমনের

উপর জর্ম্মাণ মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্ম্মাণ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন—সে পুস্তকের নাম Under the Eyes of the Barbarians। জর্ম্মাণ জাতির আদিম বর্ব্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আকার ধারণ করেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে তা ফরাসি মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্ম্মাণ সাহিত্যের ফরাসি পাঠকেরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্ম্মাণ অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই—এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরপক্ষে জর্ম্মাণ অভিধানে humanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণস্বরূপ,—ঈষৎ অবান্তর হলেও,—এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।

(৭)

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে লোকভাষা, মৃতভাষা এবং বিদেশী-ভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও, অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিমভাষা—অর্থাৎ সাধুভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশী বাক্যব্যয় করতে চাই নে; কেননা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি; সে সব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে ছেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে—তখন সেই মৃতভাষার রচনা-পদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়;—পদে ও বাক্যে Latinism-এর আমদানি ইংরাজির আদি গদ্য-লেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা করব, সে ত নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে একশ বছর হলেও, তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চলছে। প্রথম যুগে, সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চলছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরাজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের—মুখে এসে পৌঁচেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে কৃত্রিম। তারপর আর একটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; অপরপক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই, লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সে দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্ব্বযুগের লিখিত ভাষা পরযুগের

কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও, অর্দ্ধমৃত ত বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চল্‌তি ভাষার বিরোধের কলরবটা কিছু বেশী, কেননা এ হচ্ছে জ্ঞাতি-শত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্য-জগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার পক্ষে সাহিত্যরাজ্য অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্য সত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্য্যেরা যে সাহিত্যের একলব্য-দের অঙ্গুলিচ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরাট করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জ্জন-করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জ্জন করা যায় না। Plato, Aristotle-এর যুগ থেকে সুরু করে অদ্যাবধি, সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আস্‌ছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশী ভাষার সঙ্গে স্বদেশী ভাষার লড়াইও ত ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবন-সংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।

(৮)

ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গভাষার উপর ফেলে দেখা যাক্, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? বঙ্গ-ভাষার পুরাতত্ত্ব আমরা আজও পুরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের

ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবী যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে সেটিকে ইংরাজি যুগ বলা যায়।

নবাবী যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পদ্যে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবী আমলে বাঙ্গালী যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মন্বর্থ-মুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লুকভট্ট তাহিরপুরের রাজবংশের, এবং কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে' নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও, প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিম্বদন্তিতে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্য স্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাঙ্গলার নব্যন্যায় যে নব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা ন্যায় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে! অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙ্গালী জাতির উপকার কি অপকার করেছেন, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থই

প্রমাণ যে—নবাবী আমলেও বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙ্গালী সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সে কালে বুদ্ধিবিচার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনই অধিকার ছিল না। সুতরাং এদেশে ইংরাজ আসার পূর্ব্বে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি vulgar tongue-অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরাজি আমলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শন বিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণ স্বরূপ দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরাজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ Leibnitz-এর যুগে জর্ম্মাণ ভাষার যে অবস্থা ছিল—আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে,—সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোসন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।

(৯)

বলা বাহুল্য বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডীর ভিতর আটক থাকবে—ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের

মুকুটমণি হলেও, সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তনসংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও রসতত্ত্ব-বিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ থাকত না, যদি সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা না এসে পড়ত। কদলী বৃক্ষের অন্তরে সার নেই—আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গ সাহিত্যে সেই সুগোল নিটোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী ভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে, আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,—ভাষার উৎপত্তি কর্ম্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনও উপায় নেই। অপরপক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরাজরা emotion,—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে—যথা, স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু শিৎকার চীৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। কাব্য সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, কেননা এক-মাত্র কাব্যেই, জ্ঞানের ভাষা কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা,

এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যাঁর হৃদয়রসের সঙ্গে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারও কারও হাতে একই বস্তু হয়ে ওঠে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কালিদাস সেক্‌স্‌পিয়ার দান্তে মিলটন গেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।

সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের আধষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন—এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি ব্যবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হয়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝলে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সম্বরণ কর্‌তে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" আর "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"।

(১০)

জীবন্ত ভাষার উপর মৃত ভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য, ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক্। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিমভাগের উপর একাধিপত্য করেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীকভাষা সে যুগে রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলেও, সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে

রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংশের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করে—তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ কর্‌লে;—যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হয়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্ম্মরাজ্যের Eternal City, অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনও বিশেষ ধর্ম্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজন ধ্যানধারণা উপাসনা আরাধনা মন্ত্রতন্ত্র স্তবস্তোত্রের ভাষা যে, সেই ধর্ম্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে,—বিশেষত সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে,—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ ইউরোপে আজও অক্ষুণ্ণ থাকৃত, যদি না Renaissance এবং Reformation ইউরোপের মনকে রোমান-চর্চ্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত কর্‌ত। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীনচিন্তা ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌লে। এর ফলে, রোমের ধর্ম্ম-মন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হ'ল, এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল। গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চায় সে যুগের মনীষীগণ নূতন দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি কর্‌তে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত দর্শন বিজ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও, বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্ম্মমতের স্থান

অধিকার করতে পারে শুধু আরেক ধর্ম্মমত। তাই লুথারের প্রবর্ত্তিত Reformationই জর্ম্মাণিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।

(১১)

লুথার যেদিন জর্ম্মাণীর লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্ম্মাণ সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও, নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্ম্মমত ভাষান্তরিত হলে, রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক খৃষ্ট সংঘের সৃষ্টি হল,—একটি রোমে আর একটি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায়;—একটির নাম গ্রীক চর্চ্চ, অপরটির রোমান। New Testament যদি গ্রীক অর্থাৎ ইউরোপের ভাষায় লেখা না হ'ত, তাহলে এসিয়ার ধর্ম্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হ'ত কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য। মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।

অপরপক্ষে পৃথিবীতে যখন কোন নূতন ধর্ম্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম্ম মাগধী প্রাকৃতে।—সুতরাং লুথার যখন খৃষ্টধর্ম্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে ল্যাটিন ত্যাগ করে জর্ম্মাণ ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না করলে Protestantism ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হিসেবে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেই সকল জাতি আজিও রোমান ক্যাথলিক; রোমান্স ভাষাই রোমান চর্চ্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপরপক্ষে যে-সকল জাতির ভাষা জর্ম্মাণিক, সেই সকল জাতিই প্রটেষ্টাণ্ট। একই কারণে বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, জ্ঞান ও কর্ম্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সংস্কারকে বাংলাদেশের Reformation বলা অসঙ্গত নয়। তারপর এসেছে আমাদের Renaissance;—ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরাজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তি লাভ করেছি,—এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল;—আমাদের কাছেও ইংরাজি তেমনি, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে।

ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি;—সে ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চল্‌ছে—কিন্তু সে বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক-জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতকপরিমাণে ধর্ম্মের ভাষা বলে মান্য, কিন্তু প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙ্গালীদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

(১২)

অতএব দেখা গেল যে পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশীই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা; বলা বাহুল্য ধর্ম্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপরা বিদ্যা নয়—তা হচ্ছে theology, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরাজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে; শুধু বাল্য বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরাজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যা-লয়ের বহির্ভূত হয়ে থাক্‌বে, নয় ইংরাজির অনুচর কিম্বা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে স্থান পাবে,—ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব-শক্তিশালী হয়ে উঠবে না, এবং বাঙ্গালীর প্রতিভাও ততদিন পূর্ণ বিকাশ

লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এ পিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সে-সকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে—নচেৎ বাঙ্গালীর মন চিরকাল অর্দ্ধপক্ক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গ সাহিত্যের গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধনিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সে সকল রচনা কোনও অংশে পাকা আর কোনও অংশে কাঁচা। এ সব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের যেখানে অক্ষুণ্ণ, সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পক্বকষায় মন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্র পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণশ্রী পূর্ণশক্তি লাভ করবে না, একথাও যেমন সত্য;—অপরপক্ষে আমাদের সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় লিখেছেন—

"এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "মহাশয় আপান বাঙ্গালি, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন"? তিনি উত্তর করেন "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর

করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি"। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এ কথার উত্তর নাই"।

আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদেরও মুক্তকণ্ঠে না হোক্ রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই;—বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সে জন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করতে হবে। ইতি-মধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব কিম্বা সৌরভ নেই তার কারণ, একদিকে ইংরেজি ভাবের আর একদিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে, আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।

(১৩)

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত করতে চাই বলে, এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরাজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা করলে বঙ্গ সাহিত্যে ইভলিউসান হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ reversion এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ করব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে।

বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রাক ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক ল্যাটিনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্য-রাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশী যুগে উপরোক্ত দুটি ক্ল্যাসিকের চর্চ্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক-শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ক্লাসিক চর্চ্চা করবার সার্থকতা কি? তাহলে সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটী প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানব জনম বিফল হয়; দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে উদ্যত হবেন যে, অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্ত্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে; এবং আর্টিষ্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্লাসিক সাহিত্যের এমন একটী গুণ আছে, যা বর্ত্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট—এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এ সকল উক্তিই সত্য; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার মধ্যে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটী আর্য্য ভাষাই ক্লাসিক—অপর কোনোটীই নয়। এ স্থানে একটী কথার উল্লেখ করা দরকার। অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদ্‌সম্মিত,—অর্থাৎ আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে

ন্যায়কথা। আশা করি কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। এই তিনটী ক্লাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটীই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়;—সে সাহিত্যে আধ আধ ভাষ, কিম্বা গদগদ ভাষের স্থান নেই, সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্ব্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোনও ভাষাই অপর কোনও ভাষার আওতায় পড়ে নেই,—সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান; অথচ সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশী ভাষা ব্যতীত আরও অন্তত দুটি তিনটি বিদেশী ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি?—এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চা ছেড়ে দিলে, মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়,—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত, ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার

করবার জো নেই যে, যে-জাতি মনে যতই বড় হোক্ না কেন, তার মনের একটা বিশেষরকম সঙ্কীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙ্গবার জন্য বিদেশীমনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে—এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে, তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে,—আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে, আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনও দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগ-বাটোয়ারা করি,—সত্যের আলোকে এ সব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে, আমাদের পক্ষে শুধু ইংরাজি নয়, সেই সঙ্গে ফরাসি এবং জর্ম্মাণও শেখা দরকার। ইংরাজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের মনের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু অনুবাদের মারফৎ সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফৎ গান শোনার মত; অর্থাৎ ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কাণে যন্ত্রধ্বনি আকারে এসে পৌঁছয়। সে যাই হোক্, আজকের দিনে ইংরাজির চর্চ্চা ত্যাগ করলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান

ভাষা হলে ইংরাজি-বাণী আর প্রভুসম্মিত থাকবে না, সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে—প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব।

(১৪)

আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে "স্বরাজ" ছাড়া অপর কোনও কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজহাতে গড়ে তুলতে হয়। তারপর দেশের স্বরাজ্য ইংরাজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও, মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেননা এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে, তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।

এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যাঁরা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড় সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অভ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের স্বপক্ষে তাঁরা Pericles-এর Athens, Augustus-এর রোম, Elizabeth-এর ইংলণ্ড এবং Louis xiv-এর ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ, আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব্ব করে, অতএব বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয় এ মত মেনে নেবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের

অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মাণীতে অমন অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয়শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান যেদিন সমবেত জর্ম্মাণ জাতিকে পদদলিত করে Jena নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গেটে ও হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবত এঁদের একজন কাব্যের, আর একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জ্জন যে এঁদের যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ করেছিল—এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্ম্মাণ জাতি সাংসারিক হিসেবে অপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে, কিন্তু জর্ম্মাণ সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।

আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। Pericles-এর Athens প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, জাতীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে,—হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্পবাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা—তখন তার অবসর চিরকালই

আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গলীর ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলার বেখাপ বর্ণমালা।

—:০:—

হরিকে সে কেন অরি বলে, এক চাষার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে উত্তর করে—"কইতে কই অরি কিন্তু নিক্‌তে নিকি অরি!" আমরা, বাঙালীরা, কইতে কই বাংলা, কিন্তু লিখ্‌তে লিখি সংস্কৃত—অন্তত, লেখবার বেলা সংস্কৃত-গোচের একটা সাধু-ভাষার চর্চ্চা ক'রে আসা গেছে; যাতে ক'রে অনেক সময়, দ্বিজু রায়ের গানের গ্রন্থকারের রচনার মত, "দিনের মত বিষয় হত রাতের মত অন্ধকার, জলের মত বিষয় হত ইঁটের মত শক্ত!"

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, এ সহজ তত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র করলে কিছুদিন আগে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার বেধে যেত। ক্রমে, কি ভাগ্যি, সত্যি কথাগুলি আমাদের দেশের লোকের গা-সওয়া হয়ে আস্‌ছে। বাঙালীর বুকের পাটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাটাও ক্রমশ নিজমূর্ত্তি ধ'রে সেবকদের কাছে দেখা দিচ্ছে।

সংস্কৃত-ছাঁদে চলবার চেষ্টা ক'রে বাংলা ভাষার যে দুর্গতি হয়েছে তার খবর আমরা মাঝে মাঝে সবুজ পত্রের পাতায় সম্পাদক মশায়ের কলম থেকে পেয়ে থাকি। সম্প্রতি, যে গবেষণার ফলে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন, তার এক অংশ দেখার সুযোগ ঘটায়, খাঁটি বাংলায় যত রকমের শব্দ শোনা যায় তার লিপি হিসেবে সংস্কৃতের নকল-করা বর্ণমালা কতটা খাপ-ছাড়া, তা বুঝতে আর বাকি নেই।

পাঁচ ভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চায় সুনীতি বাবু যে অধ্যবসায় দেখিয়েছেন, সূক্ষ্ম আওয়াজ কানে ধরবার, মিশল আওয়াজ ছাড়িয়ে দেখবার তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতার পারচয় পাওয়া যায়, তাতে ভরসা হয় যে এত দিন পরে একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ জুটবে। গ্রন্থটা শেষ হতে দেরী লাগবে, বর্ণমালা সম্বন্ধে যেটুকু হয়েছে তাও প্রকাশ হয় নি। সুতরাং তা থেকে দু-চারটি কৌতুকের কথা তুলে নিয়ে আমার এ প্রবন্ধের কাজে লাগিয়ে নিলে দোষ কি?

পণ্ডিতী ভাষায় লিখতে থাকলে পণ্ডিতী বর্ণমালার ত্রুটি বড় ধরা পড়ে না। মুখের কথার শব্দগুলি লেখায় ঠিকমত আনবার চেষ্টা করলে তবেই ফ্যাসাদে পড়তে হয়। তখন টের পাওয়া যায় যে ছেলে-বেলার মুখস্থ বর্ণমালা গোড়ায় বাংলা ভাষার জন্যে তৈরী হয় নি। সাহেবের সামনে বার করবার জন্যে শিশু বাংলা ভাষাকে সস্তায় পাওয়া ready-made পোষাকে সাজাতে গিয়ে তার চেহারাও খোল্‌তাই হয় নি, তার অবাধে চলা-ফেরাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

প্রথমত, বাংলা কথা কইতে যত রকমের যতগুলি আওয়াজ মুখ দিয়ে বার হয়, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা দিয়ে তা ত লিখে দেখাবার উপায় নেই। আবার এই বর্ণমালায় কোন কোন শব্দের একের বেশী অক্ষর থাকায়, কোন্‌টি কোথায় খাটে তা বুদ্ধি খাটিয়ে জানবার যো নেই; হয় সকলে মিলে, চোখ বুজে, একই বদভ্যাস বজায় রাখা, নয় নানা মুনির নানা মত ফলান, এ দুই দোষের মধ্যে একটা এসে পড়ে। তার উপর এমন অক্ষরও সব আছে যারা

* এ প্রবন্ধে শব্দ কথাটা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না। পাঠকরা অনুগ্রহ ক'রে ওর বাংলা মানে "আওয়াজ" মেনে ধ'রে নেন।

বেকার ব'সে থেকে জায়গা জুড়ে আছে মাত্র। লাভের মধ্যে, বানান শিখতে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়, ছাপাখানার ঝঞ্ঝাট ও খরচ বাড়ে, আর বাংলা typewriter অভ্যুদয়ের পথে কাঁটা পড়ে।

বর্ণপরিচয়ের হাল সংস্করণে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ফর্দ্দে ৪০টি অক্ষর দেখা যায়। পাঁচ বর্গের পাঁচটি ক'রে ২৫; য থেকে হ পর্য্যন্ত ৮; আর হ-র পর ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ এই ৭টি। সাধে বলি পণ্ডিতী-বর্ণমালা! যতক্ষণ সংস্কৃতের নকল চল্‌ছিল ততক্ষণ এক রকম ছিল। কিন্তু হসন্ত ত-কে খণ্ড-ত নাম দেওয়াই বা কি, আর তাকে বর্ণমালায় আলাদা স্থান দেওয়াই বা কি, কার সহজ বুদ্ধিতে আসৃত? হাতের লেখার আমলে শুধু ত-য়ে হসন্তের চিহ্ন কেন, হ-য়ে উকার, ভ-য়ে রফলা, ট-য়ে ট-য়ে, প্রভৃতি, হাতের টানে অক্ষরে-চিহ্নে জড়িয়ে, কত নতুন রকমের চেহারা দাঁড়াত—সবগুলি যে আলাদা অক্ষর ব'লে বর্ণমালায় ঢুকে পড়ে নি, এই ভাগ্যি! ছেলেবেলায় ক্ষ ও জ্ঞ-কে এ রকম অনধিকার প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল, আজকাল তারা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ছেড়ে যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রে বাঁচিয়েছে।

সে যা হোক্, সংস্কৃত আদর্শের মায়া কাটিয়ে, ছেলেবেলার মুখস্থ ভুলে, একমাত্র বাংলা উচ্চারণের হিসেবে যদি একটি বর্ণমালা বা শব্দ-মালা খাড়া করা যায়, তাহলে যা দরকার নেই তা বাদ দিলে, যা অভাব আছে তা যুগিয়েও ঐ ৪০ অক্ষরের কমেই কাজ চলে। আলোচনার সুবিধের জন্যে বাংলার শব্দসকল আমার পছন্দমত ৯টি বর্গে ভাগ ক'রে সাজান যাক্। আমার এ ফর্দ্দ থেকে ফাজিল অক্ষর সব বাদ দিয়ে, নাজাই অক্ষরের কাজ চলিত অক্ষরে ফুট্‌কি প্রভৃতি চিহ্ন যোগে সেরে নেওয়া যাচ্ছে।

১।	ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ।	৪
২।	চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ।	৪
৩।	ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ।	৪
৪।	ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ। (ৎ=হসন্ত ত মাত্র)	৪
৫।	প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ।	৪
৬।	ঙ-বর্গ—ঙ, ন, ম, ঙ। (ং=হসন্ত ঙ মাত্র)	৪
৭।	য়-বর্গ—য়, র, ল, ড়, ঢ়, ৱ (w)। ...	৬
৮।	শ-বর্গ—শ, স, চ় (ts), জ় (z)। ...	৪
৯।	হ-বর্গ—হ, guttural খ় ফ় (f), ভ় (v)। (ঃ=হসন্ত হ) ...	৪
	মোট—	৩৮

আমার এই বর্গগুলির মধ্যে প্রথম ৫টি মামুলী, তাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। চলিত বর্ণমালার অক্ষরগুলি এ স্থলে ঠিকমত কাজই দিচ্ছে—প্রত্যেক শব্দের একটি ক'রে অক্ষর, প্রত্যেক অক্ষরের একমাত্র শব্দ। কিন্তু বাদবাকি বর্গগুলিতে কিছু বা পুরোণ বিদায়, কিছু বা নতুন আমদানী হয়েছে, সে সব কথা খুঁটিনাটি ক'রে বলা দরকার।

ঙ বর্গ

চন্দ্রবিন্দু বে-ভেজাল খাঁটি নাকিসুরের চিহ্ন, তাই ওকে বর্গের মাথায় বসিয়ে ওর নামে বর্গের নাম দেওয়া গেল। তবে চন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ব্যঞ্জন-শব্দের একটি গুণ নেই, অর্থাৎ ওর সঙ্গে অপর ব্যঞ্জন শব্দের দ্বিত্ব না হয়েই যোগ হয়। দাঁতে জীভ চেপে নাকি আওয়াজ করলে ন্ (n) বেরয়, ঠোঁট চেপে করলে ম্ (m)। ঞ ও ণ-র বাংলায়

আলাদা শব্দ কিছু নেই, ওদের কাজ অপর অক্ষর যোগে চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই ফর্দ্দ থেকে এ দুটি বাদ পড়ল।

অপর ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঞ-র শব্দ ঠিক দন্ত্যন-র মত। মঞ্চ=মন্চ, গঞ্জ=গন্জ, ঝঞ্ঝন্=ঝন্ঝন্। ঞ একলা পড়লে য়ঁ ছাড়া আর কিছু নয়—ডেঞে=ডেয়েঁ। যাচ্ঞা কথায় ঞ জ্ঞ-র মত হয়ে যায় (যাচিঞা)। ঞ র খাঁটি আওয়াজ হিস্পানী Señor প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার কথায় আজও পাওয়া যায়, রাঢ়দেশের স্থানে স্থানে যাইঞা খাইঞার মধ্যে ঞ-শব্দ অস্থানে র'য়ে গেছে, কিন্তু কলকাতাই বাংলায় তা মোটেই নেই।

ণ-র "আনো" * নাম থেকে অনুমান হয় যে ওর মূর্দ্ধন্য উচ্চারণের সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ মূর্দ্ধ থেকে উচ্চারণ হয় এবং সেখানে বর্ণমালা আওড়াবার সময় ওকে "অণ" ব'লে পড়া হয়। টাকরার উপর দিকে জীভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব্দ বার হবার আগে একটা অ শব্দ আপনি এসে পড়ে। কিন্তু বাংলায়, এখনকার মত মূর্দ্ধন্য ণ-কে আবকল দন্ত্যন-র মত উচ্চারণ করতে হলে, ওকে "আনো" নাম দেবার কোন কারণ বা মানে থাকে না। যা হোক্ একালে খাঁটি মূর্দ্ধন্য ণ শব্দ বাংলা থেকে এমনি লোপ পেয়েছে যে ইচ্ছে করলেও তা বাঙালীর মুখ দিয়ে বার হওয়া ভার।

বাংলার ঙ শব্দ ন-য়ে গ-য়ে মোলায়েম মিলনের ফল। বাংলা কথায় যে-কোন দুই ব্যঞ্জন বর্ণের যোগ হলে একটি ঝোঁক এসে পড়ে,

* ছেলেদের পাখী-আঁকার ছড়া—
এক ছিল আনো
তার পিঠে চেপেছে দানো। ইত্যাদি।

যার ফলে যুক্তশব্দের একটির (প্রায়ই দ্বিতীয়টির) ণ দ্বিত্ব হয়। কর্জ্জা দুই জ দিয়েই লিখি, আর এক জ দিয়ে কর্জা লিখি, উচ্চারণের বেলা জ-টি ডবল না হয়ে যায় না। কিন্তু ঙ শব্দে গ-র দ্বিত্ব না হয়েই ন-য়ে গ-য়ে যোগ হয়েছে, তাই বর্ণমালার অপর অক্ষর যোগে এ আওয়াজটুকু পাবার যো নেই। গ-র দ্বিত্ব নিয়েই ঙ-য় ঙ্গ-য় প্রভেদ এবং সেই কারণেই কলকাতাই উচ্চারণে যাঁদের কান তৈরী তাঁরা আজকাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা না লিখে বাঙালী ও বাংলা লিখতে বাধ্য হন।

য়-বর্গ

যে অক্ষরটাকে অন্তস্থ য বলা হয় (সে যখন কথার আদ্যন্তমধ্যে সমভাবে বিরাজ করে তখন তার অন্তস্থ নাম ঘুচিয়ে দিলে মন্দ হয় না) তার আওয়াজ বর্গীয় জ থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়, কাজেই এ অক্ষর আমার শব্দমালায় স্থান পেতে পারে না। অন্তস্থ-য বাদ দিয়েও, এই তরল য়-বর্গে অপর সকল বর্গের চেয়ে শব্দসংখ্যা বেশী। বিদেশের লোকে যে বাংলা কথাকে শুনতে মিষ্টি বলে, সেটা হয়ত এই তরল শব্দের প্রাচুর্য্যে।

বাংলা য় ইংরেজী y-র কাজ করা সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর মনে কেমন যেন একটু কিন্তু র'য়ে গেছে যার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ধর্‌তে পারি নি। পূর্ব্বে য় (yaw) অক্ষরকে অন্তস্থ-অ বলা হত, এবং হয়ত তার উচ্চারণ অ-র মতই ছিল। কিন্তু আজকাল ছায়া বায়ুর ত কথাই নেই, কেয়ূর, ময়ূরকেও বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকে কেউর, মউর না ব'লে keyur, mayur বল্‌বে। সুতরাং য়ুরোপ (Europe) কে ঘুরিয়ে ইউরোপ লেখার কোনই আবশ্যক নেই। Y-শব্দের সঙ্গে বাংলার কোন বিরোধ দূরে থাক্, এটা বাঙালীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ব'লেই ত মনে হয়। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে এ শব্দটা মীড়ের মত বাংলা গানের কথার কাঁটা খোঁচা মেরে দেবার কাজে লাগে। আমাদের সঙ্গীতে যেমন এক স্বর থেকে আর স্বরে মীড়ের টানে বেমালুম যাতায়াৎ করা হয়, বাংলা গানের কথা সুরে গাইতেও তেমনি, এক স্বরবর্ণের পিঠ-পিঠ অপর স্বর উচ্চারণ করতে হলে য়-মীড় দিয়ে আওয়াজটা নরম করে নেওয়া হয়। মা-আমার গাইতে মা-য়-মার বেরিয়ে যায়; কে-আসে কে-য়-সে হয়ে পড়ে।*

দেবনাগরী ব-র বা ইংরেজী w-র শব্দ (বাংলা অক্ষরে যা পেট-কাটা ব দিয়ে লেখা যেতে পারে) কম হলেও আছে। ফার্সী থেকে নেওয়া (newa) কথায় এ শব্দ বেশীর ভাগ পাওয়া (pawa) যায়—যেমন হাওয়া (hawa), খাওয়া (khawa)। ও আর য় মিলিয়ে w শব্দটাকে জবড়জং ক'রে না লিখে, ব দিয়ে লিখলেই ত বেশ পরিষ্কার হয়—যেমন মারবাড়ী, কাবুলিবালা। তবে বিনা আমাদের দেশে ভাল ব'লে স্বীকার আর কাজে করার মধ্যে অন্তরায়টা কিছু ভীষণ গোচের।

শ-বর্গ

মূর্দ্ধন্য ষ-শব্দ ণ-শব্দেরই মত বাংলা থেকে লোপ পেয়েছে। এখন ওটা বাঙালীর পক্ষে ইচ্ছে করলেও উচ্চারণ করা কঠিন।

† র-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা যোগ হলে ফলাটি লোপ বা লুপ্তপ্রায় হয়ে যুক্তবর্ণের প্রথমটির দ্বিত্ব হয়—যেমন প্রাপ্য (প্রাপ্প), অশ্ব (অশ্‌শ), পদ্ম (পদ্দ)। র-ফলা অবশ্য লোপ হয় না—যেমন অপ্রিয় (অপ্‌প্রিয়)।

* তা ছাড়া, য়-শব্দের মোলায়েম অমায়িকতার গুণে বাংলা ভাষায় "মে" কথাটা কি না করতে পারে? কড়া কথাকে মিঠে করা, মগজের খাটনি বাঁচিয়ে জীভ-চালাবার সুখ ভোগের ব্যবস্থা করা, বক্তার বুদ্ধির অভাব শ্রোতাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করা, প্রভৃতি ওর অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নেই।

দন্ত্য-স (ইং s) শব্দটা বাংলায় এক পক্ষে কম বটে, কিন্তু অপর পক্ষে যেটুকু আছে তা নিজস্ব অক্ষর ছাড়িয়ে তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষ এদেরও এলাকার অংশ জবর-দখল করেছে—যেমন শ্রী (sri), শ্রম (srom), ষ্ট্যাম্প (stamp), ষ্টেশন (station)। ইংরেজী কথা বাংলায় লিখতে যখন বানানটা ইচ্ছেমত করার বাধা নেই, তখন স্টাম্প, স্টেশন লিখে s-শব্দটাকে ওর আসল দন্ত্য-স চিহ্ন দিতে আপত্তি কি? এ শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে ছ দিয়ে লেখা হয়—যেমন ছোলেনামা (solenama); কিন্তু ছোলে লিখলে কলকাতায় solay না প'ড়ে chholay পড়বে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, দন্ত্যস-র স্ব-শব্দ একেবারে উড়িয়ে দিলে বাংলা লিপিকে মিছিমিছি কানা ক'রে রাখা হয়।

দন্ত্যস-র জায়গাটুকু বাদ দিলে বাংলায় বাকি সব তালব্য শ-র রাজত্ব, তাই এর নামেই বর্গের নামকরণ করা গেল। সবিশেষ কথাটার তিন শ-র উচ্চারণে কোন তফাৎ নেই। এই তিন শ কথাটা শুনলে মারাঠিভাষী হাসবে, কারণ তার কাছে শ একটি মাত্র, অপর দুটীর একটি sa, অন্যটি বাঙালীর অনুচ্চারণীয় মূর্দ্ধন্য ষ,—হিন্দি ভাষায় খ দিয়ে যার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে (হিন্দি মানুখ্ = মানুষ)।

চ্ (ts) শব্দ মোলায়েম ভাবে ৎ ও স যোগের ফল। মারাঠি "চাংলা" কথাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই এর খাঁটি রূপ জেনেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের চাল, চিঁড়ে, প্রভৃতির উচ্চারণেও এই চ্ (ts) পাওয়া যায়। কলকাতাই ভাষায় যে সকল সাধু কথার ছ মুখের কথার চ হয়—যেমন "চলিয়াছি" থেকে "চলেচি"—সেই চ-র উচ্চারণ চ্ (ts) হয়, তবে মারাঠি ভাষার মত অতটা স্পষ্ট নয়—চলেচি = choletsi। ব্যঙ্গ

করেও সময় সময় চ-কে চ্-শব্দ দেওয়া হয়—যেমন চমৎকার (tsomotkar) আর কি!

জ্ (z) শব্দ কলকাতাই উচ্চারণে চলিত নেই ব'লে হঠাৎ মনে হতে পারে, কিন্তু সাজতে (shazte), বুঝতে (buzte), মেজ্দা (mezda) নমুনাগুলি পেলে আর সন্দেহ থাকে না।

হ-বর্গ

প্রশ্বাসের নানা শব্দে হ বর্গের উৎপত্তি। অবাধে শ্বাস ছাড়লে শুদ্ধ হ জন্মায়। শ্বাস গলায় বাধা পেলে আর্বী ফার্সী ধরণের guttural খ্, এবং ঠোঁটে বাধা পেলে ঠোঁটের ভঙ্গী ভেদে ফ্ (f) ও ভ্ (v) শব্দের উৎপত্তি হয়।

বাংলায় খ্-র guttural (ঘড়্ঘড়ে) শব্দ শুনতে হলে চাঁটগাঁয় যেতে হয়। কলকাতাই উচ্চারণে এ শব্দ দৈবাৎ শোনা যায় মাত্র—যেমন বিরক্তির আঃ (আখ্)।

ফ্ (f) আওয়াজটা বাংলা কথার স্বাভাবিক ধ্বনির সঙ্গে তেমন মিশ খায় না। তবে ফার্সীর ছোঁয়াচে এটা বাংলায় ঢুকে রয়ে গেছে—যেমন সাফ্ (saf), তফাৎ (tafat)। কেও কেও ফুলে ফলেও এ শব্দ আন্তে চান (ful, fal) কিন্তু সে ফেশনের বে'কুফীকে তারিফ্ করা যায় না!

ভ্ (v) বাংলার একটী বিবাদী আওয়াজ। এর ন্যায্য ব্যবহার একমাত্র হ-য়ে ব-য়ের (হ্ব) উচ্চারণে পাওয়া যায়। মারাঠি ভাষায়ও সম্ভবত তাই; কেননা মারাঠিতে Victoria-কে হ্বিক্টোরিয়া লেখে। বাঙালীর মুখে হ্ব যুক্তাক্ষরটি যথা লিখিতং তথা কথিতং হয় না।

কারও কারও মুখে ওটা ব-য়ে ভ-য়ের মত উচ্চারণ হয়—যেমন বিভ্‌ল (বিহ্বল)। কিন্তু আজকাল কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কায়দা হচ্ছে হ ও ব-র জায়গা অদল-বদল ক'রে হ-কে শেষে ফেলা, তারপর ব-কে ভ্ (v) উচ্চারণ করা। তবে সে ভ্ (v) উচ্চারণের মধ্যে একটু রকমারি আছে। যুক্তাক্ষরের বাংলা রীতি অনুসারে ঐ ভ্ (v) টার হ-র যোগে শাদা ভাবে দ্বিত্ব না হয়ে ওটা uv বা ov হয়ে যায়—যেমন, জিহ্বা = jiuvha, গহ্বর = gaovhar। সুনীতি বাবু আশঙ্কা করেন যে ভ্ (v) শব্দ সভ্য উচ্চারণকেও আক্রমণ করবার যোগাড়ে আছে। তা যদি হয় তবে আশা করি অবস্থা এখনও voyonkar হয়ে ওঠে নি—sovvo উচ্চারণের বর্ব্বরতা ভদ্রসমাজে voolay ও চলবে না!*

বাংলার বিসর্গ বেশীর ভাগ হসন্ত হ মাত্র। সময় বিশেষে হ-বর্গের অপর হসন্ত বর্ণেরও কাজ করে—যেমন, উঃ (uf), আঃ (german ach!)। বাংলা কথার শেষে বিসর্গটার আওয়াজ লোপ পেয়েছে সুতরাং সেখানে ওর ফাঁকা চেহারা দেখিয়ে লাভ কি? বিদ্যাসাগরের আমলে শ্রেয়ঃ স্রোতঃ প্রভৃতি বিসর্গ দিয়ে বানান করা হত, এখন

* বাংলা ভাষায় v শব্দের অনধিকার চর্চ্চার মূল সম্বন্ধে আমার Theory এই—

ইংরেজ আমলের আগে এ শব্দ বাঙালীর মুখে আনাও দরকার হত না, জানাও ছিল না। কাজেই রাজভাষার v যখন দায়ে ঠেকে বার করবার চেষ্টা করতে হল, তখন প্রথম প্রথম বাংলা ভ দিয়েই তার কাজ চালিয়ে দিয়ে, Victoria কোনমতে প্রকারে ভিক্টোরিয়া ব'লে উচ্চারিত হল। ক্রমে, ইংরেজী উচ্চারণ সড়গড় হতে, যখন মুখ দিয়ে খাঁটি v কাড়া সম্ভব হ'ল, তখন নতুন বিদ্যের আহ্লাদে দরকারে-বেদরকারে যেখানেই ভ দেখা, সেখানেই v বলার লোভ সামলান মুস্কিল হয়ে পড়ল। তাই বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইলের নাটকের বিজ্ঞাপনে Vramar! Vramar! ক'রে ক্ষেপিয়ে তোলে। রোগের উৎপত্তি ঠিক করতে পারলে চিকিৎসার বিলম্ব হবে না এই আশায় Theory টি ব'লে রাখা গেল।

সাবালক ব্যাঙাচীর মত স্রোত বিনা ল্যাজে বেশ চলেছে। তবে আর কেন? আপাতত ক্রমশ প্রভৃতির বিসর্গগুলিকেও কালের স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়াই শ্রেয়।

স্বরবর্ণ

বাংলা শব্দের লিপি হিসেবে পণ্ডিতী ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণের গণ্ডগোল আরও বেশী। বর্ণপরিচয়ে আজকাল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, এই দশটি স্বরবর্ণ দেখান হয়। এ ফর্দ্দটি অসংযুক্ত স্বরে যুক্তস্বরে, কেজো অক্ষরে বাজে অক্ষরে, এবং তদুপরি আবশ্যক অক্ষরের অভাবে, একটি আলোনা খিচুড়ি বিশেষ।

যুক্তস্বরের মধ্যে সুধু ওই (ঐ), ওউ (ঔ) কেন; আই, উই এই আছে; আউ, ইউ, এউ আছে; আও, উও, এও আছে; একহারা স্বরগুলির উল্টে পাল্টে যত রকম permutation-combination হতে পারে প্রায় তত রকমই আছে! বাকিগুলির জন্যে যখন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের দরকার হয় নি, তখন ঐ, ঔ, দুটিমাত্র রেখে বাংলা বর্ণমালা ভারী না করলেও চল্‌ত।

ঋ ৯ অক্ষর থাক্‌লে কি হবে, বাংলার মধ্যে ওরকম স্বর-শব্দ কোথাও নেই। এ দুটির আওয়াজ র-যে ইকার (রি) ল-য়ে ইকার (লি) হয়ে রয়েছে। তার জন্যে আলাদা অক্ষর কেন? * এ দুটি স্বর-শব্দ আসলে কি (সংস্কৃত ভাষায় যা থাকায় স্বতন্ত্র অক্ষর

* বিকৃতি(bikriti)তে বিক্রিতি(bikkriti)তে ক-র দ্বিত্ব ঘটিত উচ্চারণের যে তফাৎ আছে, দুঃখের বিষয় সেটা পড়বার সময় কেও কেও মেনে চলেন না। ব্যঞ্জন র-ফলার মত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন-শব্দের দ্বিত্ব ঘটাতে না পারায় ঋকারের যা একটু স্বরত্ব বাংলায়ও রয়ে গেছে।

আবশ্যক হয়েছিল) তাই বা ক'জন বাঙালী খবর রাখে ? ঋ হচ্ছে র-র রত্ব অর্থাৎ জীভ কাঁপার মর্ম্মর রব। আর ঌ হচ্ছে ল-র লত্ব অর্থাৎ জীভের ধারে ধারে লালা-কল্লোল কলধ্বনি। ইংরেজী little কথার শেষে ঌ-র আওয়াজ পাওয়া যায়। ফরাসী chambre (উচ্চারণ শাঁব্র্‌) কথার শেষে ঋ। সংস্কৃত আমলে লিট্‌ঌ ও শাঁব্ঋ লিখ্‌লে এই ইংরেজী ও ফরাসী কথা দুটি ঠিকমত উচ্চারণ হতে পারত, কিন্তু ও ভাবে বানান করলে বাঙালীর দ্বারা তা হবে না।* মোট কথা বাংলার চলিত কোন স্বর শব্দ লিখতে ঋ বা ঌ অক্ষরের কোন প্রয়োজন হয় না।

বাংলার অ সংস্কৃত অ-র মত, হ্রস্ব আ (আ) নয়। আমাদের অ একেবারে আলাদা স্বরশব্দের চিহ্ন যার আওয়াজ ইংরেজী aw দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

ইকার ও উকারের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে তেমনি বাংলার অপর সকল স্বরশব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, কিন্তু সে সবের জন্যে স্বতন্ত্র অক্ষরের অভাবেও কাজ বেশ চ'লে যাচ্ছে। তাতে বোঝা যায় যে দীর্ঘ ঈ ও ঊ অক্ষর বাহুল্য। এমন কি, ইকার উকারের আলাদা হ্রস্ব দীর্ঘ চিহ্ন না থাক্‌লেই ভাল হত, কারণ বাংলার বানান্ চলে একদিকে উচ্চারণ বলে অপর দিকে, তাতে ক'রে বাংলা ছাত্রের মাথা খারাপ করা ছাড়া এই ফাজিল চিহ্নগুলি আর কোন কাজে লাগে না।

---

* দাক্ষিণাত্যে ঋ, ঌ-কে বাংলা হিন্দির মত রি, লি উচ্চারণ না ক'রে, রু, লু বলে। দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগ সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলার চেয়ে বিশুদ্ধ ব'লে বাঙালীরা অনেক সময় মনে করেন যে এই রু, লু-ই বুঝি খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ। কিন্তু উপরে দেখান গেছে যে তা নয়। সুনীতি বাবু দেখেছেন যে কোন প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ঌ-র আসল উচ্চারণ বজায় রাখা হয় নি।

আমরা লিখি তিন, বলি তীন (ইকারের হ্রস্বত্ব ইং tin শব্দে খাঁটি পাওয়া যায়) ; লিখি সতী, বলি সতি ; লিখি কুল, বলি কূল (হ্রস্ব উকার কাকে বলে তা হিন্দী কুল্ শব্দে পরিষ্কার শোনা যায়) ; লিখি মুহূর্ত্ত, বলি মুহুর্ত্ত।

যাহোক্, যত রকম স্বরশব্দ আছে, আর এক এক স্বরের যত রকমের মাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি) পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত সমেত তার ফর্দ্দ ধ'রে দিলেই আসল অবস্থাটা ত বোঝা যাবে। তবে, কোন কালে সংস্কৃত বর্ণমালার হাতথেকে রেহাই পেয়ে, বাংলার অবস্থার মত ব্যবস্থা হয়ে উঠ্‌বে কি না তা' কে বল্‌তে পারে ?

যে স্বর-শব্দমালা নীচে সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে সেটা পড়বার সময় মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য দুরকমে হয়—১। টানে ২। ঝোঁকে। যেমন বাক্য কথাটার আকার ঝোঁকে দীর্ঘ, বাক্ কথাটার আকার টানে দীর্ঘ। রাধার রা ঝোঁকে দীর্ঘ, রাধার ধা ঝোঁক টান দুয়েরই অভাবে হ্রস্ব। ইং hat, mat, cat সবই হ্রস্ব ; এক (অ্যাক) টানে দীর্ঘ ; act ঝোঁকে দীর্ঘ।

হ্রস্ব—ইং doll (ডল্), কত, কথা, অকপট।
অ দীর্ঘ—ইং ball (বল্), ছল, দল।
চাপা—ইং cut (কট্), বস্, আপনি, আমরা।

লুপ্ত অকারের চিহ্নটা সংস্কৃত কথা অবিকল লিখতে ছাড়া বাংলায় কোন কাজে আসে না।

হ্রস্ব— আমি, রোগা, রাধার ধা।
আ দীর্ঘ—রাধার রা, গাছ, বাড়ী।

হ্রস্ব—চিঠি, পাই, সতী, চাষী।
ই দীর্ঘ—তিন, দীন, বীর, স্থবির।
অস্ফুট—পূর্ব্ববঙ্গের কাইল (কালি), বাইক্ক (বাক্য) প্রভৃতি।
কলকাতাই উচ্চারণে এই ই-শব্দটা অস্ফুট ভাবেও নেই, অর্থাৎ অস্ফুট ই-টা লোপ পেয়েছে।*

হ্রস্ব—সাধু, তূলা, ধূলা।
উ দীর্ঘ—চুল, কুল, কূপ, রূপ।

হ্রস্ব—লোহা, বোঝা, গতি (গোতি) মন্দ (মোন্দো)।
ও দীর্ঘ—রোগ, শোক, শ্রম (srom) যম (জোম)।

হ্রস্ব—একটু, বেদানা, সময়ে, ব্যক্তি (বেক্তি)।
এ দীর্ঘ—বেদ, উদ্দেশ, ক্লেশ।

হ্রস্ব—ব্যস্ত (ব্যাস্ত) ত্যজ্য (ত্যাজ্য), সমস্যা।
অ্যা দীর্ঘ—এক (অ্যাক), ত্যাগ, ব্যাকুল।

হ্রস্ব-দীর্ঘের আলাদা চিহ্ন দরকার নেই তা ত দেখা গেল। কিন্তু বাহুল্য নিয়ে যদিবা চালান যায়, তবু অভাব নিয়ে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না। বাংলা এখন আর কুনো অবস্থায় নেই—বিদেশী কথা

* কলকাতাই উচ্চারণে সাধু ভাষার ই যেখানে যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে কিন্তু সে তার প্রভাব রেখে গেছে। অন্যান্য গুণের মধ্যে ইকার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ ওকারের মত ক'রে দেয়। আমরা সাধু "করিয়া" স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের মত "কইর‍্যা" বলি নে বটে, কিন্তু "কোরে" বলি। মুখের ভাষা লিখতে হলে সমাপিকা করে (kawre) ও অসমাপিকা করে (kore) এ দুইয়ের প্রভেদ বাঁচিয়ে বানান করা উচিত, নইলে পাঠকের পড়তে গোল লাগবে। কেও কেও ক-য়ে ওকার দিয়ে অসমাপিকা "কোরে" লেখবার পক্ষপাতী, কিন্তু তার চেয়ে লুপ্ত ইকারের চিহ্ন দিয়ে "ক'রে" লেখা ভাল, এ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের সঙ্গে মতের মিল হবে, কারণ তাহলে বানানের মধ্যে উৎপত্তির ইতিহাসটুকু থেকে যায়।

নিয়ে কারবার করতে হচ্ছে, বিদেশীর কাছে নিজেকে জাহির করতে হচ্ছে, কাজেই একছুটে থাকলে আর ভাল দেখায় না। মারাঠিতে খোলা অ (all), চাপা অ (us) ও অ্যা শব্দের অক্ষর ছিল না। তারা অকারে চিহ্ন দিয়ে চাপা অ, আকারে চিহ্ন দিয়ে খোলা অ, একারে চিহ্ন দিয়ে অ্যা, ক'রে নিয়েছে—যেমন অাঁল্ (all), অঁস্ (us) আমি বলি মাথায় ˙ দিয়ে চাপা অ, আর মাথায় ✓ দিয়ে খোলা এ (অ্যা) বাংলায় বেশ চিহ্নিত হতে পারে। যেমন cut=কট্, cat=কেট। এ ছাড়া আবশ্যক মত য়ুরোপীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাধারণ চিহ্ন ব্যবহার করলে আর বাংলার স্বরলিপিকে কোন শব্দ লিখনে পিছপাও থাকতে হয় না। ওদিকে ত ব্যঞ্জন লিপিতে ব-র পেট কেটে, আর জ, ফ, ভ-তে বিন্দু দিয়ে, সকল চলিত ব্যঞ্জন-শব্দের অক্ষর পূরণ ক'রে নেওয়া গেছে।

চিহ্নের কথা বলতে মনে হ'ল যে বাংলা হাতের লেখা থেকে ছাপার অক্ষর তৈরী সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে মাথা খাটান হয় নি। চীনে ভাষার কম্পোজিটারদের মত ঘরের এক পাশ থেকে আর এক পাশ দৌড়-দৌড়ীর আবশ্যক না হলেও অক্ষর ও চিহ্নের বাহুল্যের কারণে বাংলা ছাপাখানার অনেক অনর্থক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। রেল-গাড়ি মোটর-গাড়ি সবই প্রথম প্রথম ঘোড়া-গাড়ির গড়নে তৈরী হয়েছিল, ক্রমে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুসারে তাদের চেহারা বদলে এসেছে। বাংলার ছাপার অক্ষরেরও এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করবার সময় হয়েছে। কিন্তু এ আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'পঞ্চক'।

—:০:—

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।"

চৈত্র মাস। প্রচণ্ড রোদ। তমালতালীর কাঁধে কাঁধে কোমলাঙ্গী লতিকারা সব শুকিয়ে উঠেছে। কাকেরা পর্য্যন্ত ডাকছে না। তারা সব নিবিড় বনে নিবিড়তম ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মার্ত্তণ্ডদেব যেন সহস্রমুখ হয়ে চারিদিকে আগুণ ঢেলে দিচ্ছেন। রাজার পথে পশ্চিমে হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ছে সাংঘাতিক। কিন্তু সে হাওয়া সে ধূলি অচলায়তনের দেয়াল পর্য্যন্ত এসে থেমে যাচ্ছে। তাদের প্রবেশ এখানে নেই। বাহিরের সুখ বাহিরের দুঃখ, বাহিরের হাসি বাহিরের অশ্রু—বাহিরের আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস আনন্দ—সে-সবের প্রবেশ এখানে জন্ম-জন্মান্তর থেকে নিষিদ্ধ। এখানে সে হচ্ছে অচলায়তন। যেখানে হাজার হাজার বছরের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা নিয়মে বাঁধা জীবনের ভিতর দিয়ে পাকা মানুষ তৈরী হ'য়ে উঠছে। এখানে একটু কারও ভুল করবার আশঙ্কা নেই—একটু কারও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে মানুষের সুপ্তির স্থান—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

রাজার পথে মত্ত হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ুক—কিন্তু এখানকার গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ছে না। কি জানি যদি সে নড়াতে একটু

কিছু ঘুলিয়ে যায়। কি জানি যদি সে নড়া দেখে কারও মনে প্রশ্ন ওঠে যে গাছের পাতাগুলো নড়ে কোন্ নিয়মে। আর সেটার উত্তর বের করতে গেলে হয়ত অচলায়তনের প্রাচীরগুলো পর্য্যন্ত পাগল হ'য়ে একদিন উঠে হাঁটতে লেগে যাবে। তাই এখানের গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। এখানকার পাখীগুলো পর্য্যন্ত ডাকে শাস্ত্রানুসারে—তাদের ডাক বনের পাখীর ডাকের মত তেমন অকেজো একেবারেই নয়। তাদের প্রত্যেক ডাকের একটা ভীষণ রকম মর্ম্ম আছে। কোনটায় বা দিনশুদ্ধি হচ্ছে—কোনটায় বা রাত্রিশঙ্কা হরণ করছে—কোনটায় পিশাচ-ভয়ভঞ্জন ঘটছে—কোনটায় বা সর্পভয়নিস্তারণ আসছে। চারিদিকে সাংঘাতিক শান্তি নিদ্রার চাইতেও আবেশময়—মৃত্যুর চাইতেও মৌন—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

সেই চৈত্রমাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করে' অচলায়তনে যে যার যার মতো আপন আপন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে—সেই বিরাট শান্তি উপভোগ করবার জন্যে। কিন্তু বেচারা পঞ্চকের আর শান্তি নেই। তার উপর আজ কড়াকড় হুকুম হয়েছে যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাকে অজতন্ত্র থেকে শৃঙ্গীশাপ মোচনের স্বস্ত্যয়নটা মুখস্ত করতেই হবে। নইলে তার জলস্পর্শ নিষিদ্ধ। পঞ্চক বৃহৎ অজতন্ত্রখানা কোন রকমে টেনে তার আপনার কক্ষে এনে শৃঙ্গীশাপ-মোচনটা বার বার করে' আবৃত্তি করছিল আর পূর্ব্বজন্মে তার মাথার ওপরে দুটো শৃঙ্গ থাকার কতটা সম্ভাবনা ছিল এবং পরজন্মে তার মাথায় শৃঙ্গ গজাবার কতটা সম্ভাবনা জমা হয়ে উঠছে তাই এক এক বার ভাবছিল। পঞ্চক যত বেশী করে' তার মন সেখানে লাগাতে

যাচ্ছিল অজতন্ত্রখানা যেন তত বেশী দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছিল। যত বেশীবার সে পড়ছিল তত বেশী তার মন লাগছিল না। এই রকম যখন পঞ্চকের সঙ্গে আর অজতন্ত্রের সঙ্গে একটা বিরাট সংগ্রাম চল্‌ছিল তখন কোথা থেকে কোন্ পথ দিয়ে কোন রন্ধ্র খুঁজে হঠাৎ—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণ্‌গুণিয়ে,—

পঞ্চকের হৃদয়টা যেন চক্ষের পলকে মুখের মধ্যে লাফিয়ে এলো—তার মর্ম্মতলের কোথায় কোন্ নিভৃতে একটী বহুদিনের ভুলে-যাওয়া মর্‌চে-ধরা তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—অজতন্ত্রের অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সারের মতো যেন ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল—প্রকাণ্ড পুঁথি-খানা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—পঞ্চক তার কান মন প্রাণ—তার সমস্ত অস্তিত্বটা দিয়ে শুন্‌লে সেই ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনঃ—

আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে

ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে যায়! এই সহস্র সহস্র বৎসর খাড়া হয়ে আছে যে অচলায়তন—যেখানে ভাবনা নেই চিন্তা নেই—আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই—দুঃখ নেই সুখ নেই—যেখানে আছে শুধু অভ্যাস আর সোয়াস্তি—যেখানে আছে শুধু শান্তি আর সংযম—সেখানে ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু এসে কার কথা শুনিয়ে যায়। ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে গেল! হায় পঞ্চক!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! কোন্ শক্তি তার ক্ষুদ্র দুটী পাখাতে জড়িয়ে সে এ জগতে এসেছে! কোন শক্তি? তার সে-শক্তিতে যে আজ অচলায়তনের চব্বিশ হাত উঁচু সাত হাত পুরু দেয়াল কেঁপে উঠ্‌ল—তার সে গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনে যে বড় বড় সমাসের ঢাকের বাদ্য, বড় বড় অলঙ্কারের করতালের ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি সব বেখাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! তার আলাপে যে আজ শাস্ত্রের নিষেধ-গুলোকে প্রলাপের মতো মনে হচ্ছে! আজ যে ঐ রত্তিটুকু ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে বেরিয়ে পড়বার জন্যে অন্তর-দেবতার আসন থেকে তাগিদ্ আস্‌ছে—ঐ গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে—দীপ্ত আকাশের তলে তলে—মুক্ত বাতাসের সুরে সুরে—বুঝি—বুঝি—সেই কথা আমাকে শুনিয়ে যায়—হায় আজ

কেমনে রহি ঘরে
মন যে কেমন করে
কেমনে কাটে গো দিন দিন গুণিয়ে।

না, দিন আর কাটে না। পঞ্চকের দিন আর কাট্‌বে না এখানে—এই অচলায়তনে। কোন্ মায়া বিস্তার করে' আজ ক্ষুদ্র পতঙ্গ পঞ্চকের রুদ্ধ অন্তরের দ্বার খুলে সেখানে কার আহ্বান, কার সংবাদ রেখে গেল। ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চকের হৃদয়-বীণার কোন্ পরদার কোন্ তারটী সৃষ্টির আদি থেকে বাঁধা ছিল যে আজ তার গুঞ্জন পঞ্চকের কান দিয়ে পশে' সেই তারটায় আঘাত কর্‌লে—সে-তার যে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—পঞ্চককে পাগল করে' দিয়ে গেল। সে-সুরের স্পর্শে কোন্ পুরুষ জেগে উঠ্‌ল পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে—কোন পুরুষ—যে এতদিন কোন কথা কয় নি, কোন সাড়া দেয় নি—পঞ্চাশ হাজার বছর সে এমনি করে' লুকিয়ে ছিল। কে জান্‌ত যে এমন কেউ আছে পঞ্চকের অন্তরে যে এই অচলায়তনের দেড় হাত জায়গায় আঁট্‌বে না। যদি জান্‌ত তবে বুঝি ঐ অচলায়তনের বিরাট প্রাচীর অমন সগর্ব্বে আকাশে মাথা

উঁচু করে' দাঁড়াতেই পারত না। যখন একবার দাঁড়িয়েছে—যখন পঞ্চকের অন্তরে সেই বিরাট পুরুষ জেগেছে তখন সেই প্রাচীরের উদ্ধত মস্তক নীচু কর্‌তেই হবে—নইলে যে পাথরগুলো দিয়ে ও প্রাচীর তৈরী হয়েছে, সে পাথরগুলোকে তুচ্ছ বালিরাশির মতো ঝুর্ ঝুর্ করে' ধসে' পড়তে হবে—অন্য উপায় নেই। ঐ প্রাচীর খাড়া করে' রাখ্‌তে হ'লে পঞ্চককে মর্‌তে হবে। পঞ্চক মর্‌বে! অসম্ভব—পঞ্চকের মর্‌বার উপায় নেই—পঞ্চককে যে বাঁচতেই হবে।

পঞ্চককে বাঁচতেই হবে—ভগবানের আদেশ। ভগবানের আদেশেরও উপরে যারা আদেশ চালাতে চাইবে তাদের এই বিশ্ব-মানবের মহা মেলায় অপমান হবে পদে পদে, পলে পলে। যারা পঞ্চককে ঘিরে রাখতে চাইবে তারা ভগবানকেই বন্দী কর্‌বে—আর ভগবানকে বন্দী কর্‌লে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মানুষের অকল্যাণ ও অমঙ্গল হবে—আর তার পরিমাণ হবে হিমাদ্রির চাইতেও উঁচু, সিন্ধুর চাইতেও গভীর।

সমস্ত জগৎ জুড়ে যে আনন্দের সুর নিশিদিন বাজ্‌ছে সেই আনন্দের সুর যারা কান পেতে হৃদয়ের তলে তলে শুন্‌তে পায় নি—যে আনন্দের আলোক সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে আছে সে-আলোক যারা মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে আঁখি মেলে দেখতে চায় নি তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে আপনার চারপাশে গণ্ডি টেনে দিয়ে এ জগতকে দেখা দুঃখময় করে', অমঙ্গলময় করে', অশুচি করে' অপবিত্র করে'—তাদের পক্ষেই মানা সম্ভব হয়েছে এ জগতটা সয়তানের সৃষ্টি—এ জগৎ সয়তানের ইশারায় চল্‌ছে। কোথায় গো তোমার ভগবান যদি তিনি ঐ মুক্ত উদার নীল আকাশের মাঝে নেই—যদি তিনি ঐ বর্ষার কালো

মেঘের ঝিলিক্-হানা গুর্ গুর্ ডাকের মধ্যে নেই—যদি তিনি প্রথম আষাঢ়ের ঝর্ ঝর্ ধারায় ভেজা চষা-মাটির গন্ধে নেই—ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমর-টুকুর পক্ষগুঞ্জনে নেই—মানুষের হৃদয়তলের মুক্তির সঙ্গীতে নেই। কোথায় আছেন তিনি—কোথায় তাঁকে বন্দী করে' ক্ষুদ্র করে' অক্ষম করে' লুকিয়ে রেখেছ? কোথায় তাকে অশুচি করে' ভীত শঙ্কিত করে', মিথ্যা করে', অপমানিত করে', অপরাধের সীমা বাড়াচ্ছ? হায়! অচলায়তনের কারও চোখে পড়ে নি যে ভগবানকে বাঁধতে গিয়ে তারা নিজেরাই বাঁধা পড়েছে—ভগবান যেমন তেমনি আছেন—তাঁর সৃষ্টি যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌ছে।

পঞ্চকের আর এ অচলায়তনে থাকা চল্‌বে না—কিছুতেই না। আজ যে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরটুকুর মৃদু-গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত জগতের আনন্দের প্রতিনিধি হ'য়ে এসে পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে আগুন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। ওগো—জাগো—জাগো—শতাব্দী শতাব্দী ধরে' নিজের চারদিক অন্ধকারে জড়িয়ে যে আলোকের সন্ধান করছিলে প্রাণে আনন্দ নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সে-আলোক ঐ মুক্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে—সে আলোক বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলেছে—সে আলো প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে নাচছে—সে-আলো হৃদয়-বীণার সুরে সুরে বাজছে—ঐ যে সে "আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি"—ঐ যে সে "আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল মেতে মল্লিকা মালতী"—সে আলোক মানুষের কর্ম্মে আশায় আকাঙ্ক্ষায় প্রেমে ভক্তিতে প্রীতিতে শ্রদ্ধায় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আছে। না, পঞ্চকের আর এখানে থাকা চল্‌বে না। পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে যে আজ সেই আনন্দ-আলোকের স্রোত ছুটেছে—সে-স্রোতে যে সব

ভেসে গেল—যত অপমান অপরাধ, শতাব্দীর বন্ধন—শত সহস্র স্রোতের ভারী ভারী শৃঙ্খল আজ সব তুচ্ছ তৃণের মত পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল—পঞ্চককে আজ কে ধরে' রাখবে—কার সাধ্য—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।

ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।

বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

ছুট্‌বে—আজ পঞ্চক ছুট্‌বে—ছুট্‌বে আজ সে চন্দ্র গ্রহ তারায় আপনার প্রাণের সঙ্গীত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে—ছুট্‌বে আজ সে এই বিস্তৃত পৃথিবীর বক্ষে মরু গিরি কান্তারে, নগর নগরী পল্লীতে আপনার চরণ-চিহ্ন এঁকে এঁকে—ছুট্‌বে আজ সে ঐ প্রভঞ্জন-পাগল

সফেন-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ অশান্ত সিন্ধুর বক্ষ দলিত মথিত করে'! ছুট্‌বে আজ সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার ভিতর দিয়ে দিয়ে—আগ্ন জল বায়ুর মধ্য দিয়ে দিয়ে—ঐ বিশ্বমানবের মহা কোলাহলের, মহা সংগ্রামের মাঝ দিয়ে দিয়ে আপনার প্রাণের আনন্দের আগুণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে—তাতে যদি পঞ্চকের অপঘাত মৃত্যুও হয় ক্ষতি নেই—অন্ততঃ তাতে কিছু সার্থকতা আছে। অচলায়তনে ঐ শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মরার চাইতে সে-মৃত্যু অনেক গুণে শ্রেয় ও প্রেয়।

(২)

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।"

ঐ যে শোণপাংশু-পল্লীর বুক চিরে টিয়ে পাখীর চাইতেও সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে মাটীর পথটা বহুদূর চলে গিয়ে কুয়াশার মত গাছ পালার ভিতরে লুকিয়ে গেছে—সে-পথ গেছে কোন্‌খানে—তা কে জানে? ঐ পথটী বেয়ে বেয়ে সৃষ্টির আদি থেকে কত নর নারী কত দেশ জাতি কত গান কত সুর—কত হাসি কত অশ্রু আপনার আপনার গান গেয়ে গেয়ে চলে গেছে—কোথায়? তা কে জানে তা কে জানে! কোন্ পাহাড়ের পারে নিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ঐ পথ—কোন্ সাগরের ধারে নিয়ে গেছে তাদের ঐ রাস্তা—এ পথ বেয়ে কোন্ দুরাশার সন্ধানে তারা যাত্রা করেছিল—তাদের অশ্রু শেষ হয়েছিল কোথায়—তা কে জানে? বুঝি কেউ জানে না।

তা না জানুক্ তবুও ঐ পথ বেয়েই চল্‌তে হবে। এই চলাতেই যে আনন্দ। যারা প্রত্যেক পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আপনার লাভ ক্ষতির হিসেব করে' করে' চলে তারা মানুষের অন্তরের জীবন-দেবতার আনন্দ-মন্ত্রের সংবাদ পায় নি—বুঝি কোন দিন পাবেও না। এ সৃষ্টিটা যে সমস্ত অহৈতুক—এখানকার লাভটাই যে খুব লাভ নয়, ক্ষতিটাই যে খুব ক্ষতি নয়—তা তারা বুঝবে না কোন দিন। ঐ যে আনন্দ-মন্ত্র —যে মন্ত্রে ঊষার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে লক্ষ ফুল গাল-ভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—তারা কি খোঁজ করে এতে তাদের লাভ কি? তারা যে না ফুটে পারে না—সৌরভ না ছড়িয়ে যে তারা বাঁচে না। সেটাই যে তাদের সত্য। ফোটাতেই তাদের সার্থকতা—সৌরভ ছড়ানতেই তাদের গৌরব। যখন মানুষ ঐ আনন্দ-মন্ত্রে সঞ্জিবীত হ'য়ে উঠ্‌বে—ঐ আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হবে তখন "এ পথ গেছে কোন্‌খানে" এ প্রশ্ন মনে জাগ্‌লেও কোন সন্দেহ, কোন শঙ্কা তার প্রাণে বাজ্‌বে না। সে যে তখন থেমে থাক্‌তে পারবেই না। তার চলাতেই যে তখন আনন্দ। প্রত্যেক পাদক্ষেপে যে তখন তার সুর বেজে উঠ্‌বে। প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন থেকে তার তখন সৌন্দর্য্য ঝরে পড়্‌বে। সে তখন বুঝবে যে সমস্তের সার্থকতা তার আপনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সে যে—

"খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাস্‌বারই আনন্দে রে!

সে যে—

"জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দ রে!"

সে যে—

"ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।"

সে যে—

"লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।"

এ কবি-কল্পনাও নয়—পাগলের প্রলাপও নয়। এ ভগবানের সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় সত্যটুকু। তাই পঞ্চক চল্‌বে—ঐ পথ ধরেই সে চল্‌বে—এই চলাই যে তার সত্য—এই চলাতেই রয়েছে তার অমৃত।

(৩)

আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করে' বসে' আছি কবে ভগবানের ইঙ্গিতে বাঙ্গালার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঞ্চকের জন্ম হবে। কবে পঞ্চকের প্রাণের অদম্য বেগের মুখে যত আলস্য যত জড়তা সব ভেসে যাবে—যত জীর্ণতা যত মিথ্যা সব খসে যাবে—যত শঙ্কা যত অধর্ম্ম সব চক্ষের পলকে অদৃশ্য হবে। সে দিন "সনাতন জড়তার" দেয়াল ভেঙে সত্যের পথ মুক্ত হবে। সত্য যে দিন আপনার পথ পাবে—যে দিন আমরা আর সত্যকে ঠেলে রাখ্‌ব না—দাবিয়ে রাখ্‌ব না সেই দিন এই বাঙ্গালার মরা গাঙে বান আস্‌বে—বাঙ্গালীর মরা প্রাণে স্রোত খুল্‌বে। মানুষ যখন সত্য হয়ে উঠ্‌বে তখন সুন্দর ও মঙ্গল তার কাছ থেকে কিছুতেই দূরে থাক্‌তে পারবে না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।